অর্থনৈতিক উন্নয়ন - বৃদ্ধি বনাম অসাম্য

মৈত্রীশ ঘটক

(বিজ্ঞানের জগৎ, সম্পাদনা: মৌসুমী ব্যানার্জী, মহাশ্বেতা বায়েন, বিশ্বদীপ চক্রবর্তী, প্রকাশক: ভাষা সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২২)

১

অর্থবিদ্যার অনেকগুলো উপধারা আছে, কিন্তু তার মূল চর্চার বিষয় হল মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কোন কোন উপাদানের ওপর নির্ভর করে তার বিশ্লেষণ করা, এবং তার মধ্যে দিয়ে, মানুষে মানুষে এবং দেশে দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্য কেন হয় তা বোঝার চেষ্টা করা। আর, এই বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে যে যে নীতি অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সহায়ক হতে পারে, সেগুলো বুঝতে চেষ্টা করা। ভেবে দেখতে গেলে, চিকিৎসাবিদ্যা যেমন মানুষের সুস্বাস্থ্যের নির্ণায়ক উপাদানগুলি কী এবং মানুষে মানুষে স্বাস্থ্যের অবস্থার তফাৎ কী কী কারণে হয় এবং এর থেকে কোন কোন উপায়ে স্বাস্থ্যোন্নতি করা যায় বা, অসুখ সারানো যায়, এগুলো বোঝার চেষ্টা করে, অর্থবিদ্যাও সেরকমভাবেই অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে চর্চা করে।

কোন মানুষের স্বাস্থ্যই হোক বা অর্থনৈতিক অবস্থা, তার বিশ্লেষণের তিনটে দিক - এক, কেন এরকম সেটা হয় বোঝা, দুই, তার ভালোমন্দ যাচাই করা, এবং তিন, এর থেকে অবস্থার কিভাবে উন্নতি হতে পারে, তা নির্ণয় করা। ধরা যাক একজন মানুষ দরিদ্র। প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, কেন সে দরিদ্র। তার কারণ কি সুযোগের অভাবে তার উপযুক্ত শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের অভাবে জীবিকা অর্জনের উপায়গুলি সীমিত এবং মূলত শারীরিক শ্রমনির্ভর যাতে মজুরি ও আয় কম ? না কি, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে নিজের দোষে চাকরি ধরে রাখতে পারেনা বা টাকা জমিয়ে উঠতে পারেনা, এবং যা কিছু অর্থ সে পায় তা বেহিসেবি খরচ করে ফেলে সমসময়ই টানাটানির মধ্যে থাকে? আরো অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু এই দুটো কারণ যদি দেখি, তাহলেই বোঝা যাবে, দারিদ্র হল উপসর্গমাত্র - তার কারণ না বুঝলে দারিদ্র দূরীকরণ নীতি বার করা সম্ভব নয়। প্রথম ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সুযোগের বিস্তার দীর্ঘমেয়াদী

সমাধান হিসেবে ভাবা যেতে পারে, আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়প্রকল্প এবং সঞ্চয় না করার কুফল নিয়ে প্রচার (বিপদে, আপদে বা বার্ধক্যে অত্যন্ত করুণ অবস্থা যার অনিবার্য পরিণাম)।

এই প্রবন্ধটিতে আমি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, অসাম্য, ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু আলোচনা করব। একটা উদাহরণ দিই। ধরা যাক আমরা একটু টাকা জমিয়ে একটা ছোট দোকান খুললাম। তার থেকে যা যায় হয়, আমরা যদি সবটাই ব্যয় করে ফেলি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যতে আয় বাড়ার সম্ভাবনা কম। দোকানের জিনিসের চাহিদা আপনা থেকেই বাড়তে পারে (ধরা যাক, স্থানীয় জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে) তার সাথে আয় বাড়তে পারে খানিক কিন্তু একই সাথে দোকান চালাতে যা খরচ, তও বাড়তে পারে, তাই ধরে নেওয়া যায় আয় খুব একটা বাড়বেনা। কিন্তু দোকান থেকে যা আয় তা সঞ্চয় করে যদি ব্যবসার বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করা যায় (যেমন, দোকানের জিনিসের মজুত বাড়িয়ে, আরেকটু বড় ঘর ভাড়া করে, বা একজন কর্মচারী নিয়োগ করে) তাহলে দোকান থেকে আয় বাড়বে। আবার এই বর্ধিত যায় থেকে সঞ্চয় করে বিনিয়োগ করলে যায় আরো বাড়বে এবং এভাবেই ব্যবসার বৃদ্ধি হতে থাকবে। দোকানের যে উদাহরণ দিলাম, তাতে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি অনেকক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। যেমন, ব্যবসার ক্ষেত্রে যেটা আর্থিক পুঁজি বা মূলধন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের মানবসম্পদ যেভাবে বিকশিত হয়, সেটাও একধরণের মূলধন, আবার কারখানায় নতুন যন্ত্র বসলে যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশক্তি বাড়ে, সেটাও আরেকধরণের মূলধন। অর্থশাস্ত্রে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির তত্ত্বের মূল কাঠামোটি এই যুক্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে - কোন ব্যক্তি বা অঞ্চল বা দেশ, নিজেদের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ প্রচলিত মূলধন, প্রযুক্তি, এবং শ্রম ব্যবহার করে যে পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে, তা বাজারে বিনিময় করে আয় অর্জন করে, এবং সেই আয় সময়ের সাথে বাড়তে পারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ আর প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে।

তাহলে কোন মানুষ বা দেশ ধনী আর কোন মানুষ বা দেশ দরিদ্র কেন? তার উত্তর বৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করলাম তার উপাদানগুলির পার্থক্যের মধ্যে খুঁজতে হবে। যে দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েছে এবং সেই জন্যে তার পড়াশুনোর বা কোন অর্থকরী পেশায় যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাতে বিনিয়োগ করার সুযোগ হয়নি, গাড়িতে তেল কম থাকলে যা হয়, তার ক্ষেত্রেও আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি খুব বেশি দূর যাবেনা। সেরকম আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনার সাথে সাথে পৃথিবীর সর্বত্রই আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেড়েছে, যা আগেকার যুগে অকল্পনীয় ছিল। আবার প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য (যেমন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির ক্ষেত্রে জ্বালানির যোগান) সব সময়ে

আয়বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন তার প্রতিভা, অধ্যবসায় (যার মধ্যে পরিশ্রম করা আবার ভবিষ্যতে উন্নতির কথা ভেবে বর্তমানে কৃচ্ছসাধন করার ক্ষমতা ও ইচ্ছে দুইই আছে) এবং নিছক ভাগ্য (হঠাৎ কোন সুযোগ এসে পড়া) এই উপাদানগুলি তাদের আর্থিক অবস্থা নির্ধারণ করে । আবার কোন দেশের ক্ষেত্রে তার প্রাকৃতিক সম্পদ (যার মধ্যে আবহাওয়াও পড়ে), সে দেশের মানুষের শিক্ষা, দক্ষতা, কর্মক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তি ও পরিকাঠামো - এগুলি হল তাদের আর্থিক অবস্থার মূল নির্ণায়ক। আর এই উপাদানগুলির পার্থক্য মানুষে-মানুষে এবং দেশে-দেশে আর্থিক অবস্থার ফারাক তৈরি করে দেয়। যেকোন তত্ত্বের মতোই আমি যা বর্ণনা করলাম তা খুবই সরলীকৃত একটি আখ্যান। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে যে অর্থবিদ্যার যে উপধারায় গবেষণা করে দুই ভারতীয় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন (এবং আমার সৌভাগ্য তাঁদের দুজনকেই শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি) তার চর্চার মূল বিষয়ই হল এই মূল কাঠামোটির ওপর ভিত্তি করে আরও জটিল এবং বাস্তবসম্মত তত্ত্ব খাড়া করা এবং পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তার সত্যাসত্য যাচাই করা (এই বিষয়ে র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল নিয়ে আমার ২০২০ সালে লেখা প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে) ।

২

বৃদ্ধি ছেড়ে এবার আসি অসাম্যের প্রসঙ্গে। ২০১৪ সালে থমাস পিকেটির লেখা ক্যাপিটাল ইন দ্যা টোয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরী (Capital in the 21st Century) বইটি ১৯৭০ এর দশক থেকে উন্নত দেশগুলিতে আয়ের বৈষম্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকে তুলে ধরেছে। লুকাস চ্যান্সেল (Lucas Chancel) এর সাথে একত্রে লেখা সাম্প্রতিক অন্য একটি প্রবন্ধে ("Indian Income Inequality, 1922-2015: From British Raj to Billionaire Raj?", Lucas Chancel, Thomas Piketty, Review of Income and Wealth, Volume65, IssueS1, November 2019, https://wid.world/document/chancelpiketty2017widworld/) থমাস পিকেটি সম্প্রতি ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন।

এইভাবে লেখকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ভারতবর্ষে ১৯৫০ এর দশক থেকে ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত জাতীয় আয়ে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের তুলনায় উচ্চতম আয়ের মানুষের ভাগ যা ছিল তা এখনকার তুলনায় কম। কারণ, ব্যবসা-বানিজ্যের ওপর নানারকম কড়া নিয়ন্ত্রণ ছিল আর ধনীদের আয়ের ওপর কর বা রাজস্বের হার এখনকার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বেশি ছিল। কিন্তু আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে এই প্রবণতা বিপরীত দিকে ঘুরতে শুরু করল । কারণ ব্যবসার সহায়ক নীতি গ্রহণ। এই প্রবণতা প্রসারিত হল অর্থনৈতিক সংস্কার পর্যন্ত। এই অর্থনৈতিক সংস্কারের বৈষম্য ও দারিদ্রের উপর প্রভাব কি হল লেখকরা সেই পুরনো বিতর্কে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক বলে লিখেছেন। কিন্তু যেভাবে লেখকরা তাঁদের

প্রতিপাদ্য বিষয় হাজির করেছেন, তাতে মনে হতে পারে যে কম বৃদ্ধি এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ ভালো কারণ তা বৈষম্য কমিয়ে রাখে। ঠিকই, তা বৈষম্য কমিয়ে রাখে। কিন্তু তা গড়পড়তা আয়ও কমিয়ে রাখে এবং বেশি সংখ্যক মানুষকে দারিদ্রসীমার নীচে রাখে। ছাদের বাগানে টবে রাখা সব গাছই ছোট – তাতে বৈষম্য নেই, কিন্তু বিকাশের কোন সম্ভাবনাও নেই। তাই "অর্থনৈতিক সংস্কার খারাপ" বা "এর থেকে লাইসেন্স-কন্ট্রোল জমানা ভাল ছিল" এই মনোভাব কিন্তু আর যাই হোক, প্রগতিশীল নয় ।

আয়ের বৃদ্ধি এবং বৈষম্যের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে গেলে সাইমন কুজনেটসের কাজের কথা না উল্লখে করলে চলেনা। কুজনেটস্ ১৯৭১ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম পরিসংখ্যান দিয়ে দেখালেন যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রথমে বৈষম্য বাড়ায়, এবং তারপর বৈষম্য কমায়। পরবর্তীকালে জাতীয় আয় ও আর্থিক বৈষম্যের মধ্যে এই সম্পর্কটি কুজনেটস্ কার্ভ নামে পরিচিত হয়। উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে যারা তুলনায় ধনী তারা নতুন সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। এই সময়ে অদক্ষ শ্রমের অধিক যোগান গড়পড়তা মজুরী কমিয়ে রাখে। কিন্তু পুঁজির সঞ্চয় যত হতে থাকে শ্রমের চাহিদা বাড়তে থাকে । তাতে মজুরী বৃদ্ধি হয়, এবং আর্থিক বৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষেরাও পেতে শুরু করেন। এছাড়াও প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানব সম্পদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ফলে দক্ষ শ্রমের চাহিদা বাড়ায়, যাতে আয় বৃদ্ধির সুফল আরও বেশি করে কিছু শ্রেণী যারা শিক্ষা বা দক্ষতায় বিনিয়োগ করতে সক্ষম তারাও পেতে শুরু করে। এই সমস্ত কিছুর পরিণামে বৈষম্য কমে।

পিকেটি এবং চ্যান্সেলের প্রবন্ধে পরিষ্কারই লেখা আছে যে সময়ে বৈষম্য ক্রমহ্রাসমান ছিল সেই সময়ে গড়পড়তা আয়ের বৃদ্ধির হার কম ছিল। পরবর্তীকালে বৈষম্য বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। গড় আয়বৃদ্ধির হার বেড়েছে যেমন সত্যি, তেমন ধনীদের আয়বৃদ্ধির হার মধ্যবিত্ত এবং অবশ্যই সর্বনিম্ন অর্ধেক জনসংখ্যার আয়ের বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশি, একথাও সত্যি। এই তথ্যই আয়বৃদ্ধির সাথে বৈষম্যের প্রবণতার বৃদ্ধির ব্যাখ্যা দেয় এবং কুজনেটস্ এর মৌলিক যুক্তির বৈধতাকে প্রদর্শন করে।

আয়বৃদ্ধির পথ বন্ধ না করে বৈষম্যের মাত্রাছাড়া বৃদ্ধি কমাতে কি করা যায়? পিকেটি ও চ্যান্সেলের প্রবন্ধটি অবাঞ্ছিত বৈষম্য বনাম স্বাভাবিক বৈষম্যকে আলাদা করে শনাক্ত করার গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথমটির কারণ হল ধনীরা দরিদ্রের তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ পান সেই কারণে, যা অর্থনৈতিক দক্ষতা বা সামাজিক ন্যায় কোনোদিক থেকেই সমর্থনযোগ্য নয়। দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে যে প্রতিভা বা দক্ষতা তার বিকাশ না হওয়া আর্থিক বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকারক । আবার ধনীরা বিলাসে জীবনযাপন করবেন, আর দরিদ্ররা কোনমতে বেঁচে থাকবেন, তা মানবিক দিক থেকে কাম্য নয় ।

দ্বিতীয় ধরণের বৈষম্য আসে সবাইকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া স্বত্বেও দক্ষতা, প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগের পার্থক্যের কারণে। একই অর্থনৈতিক বা শিক্ষাগত পরিবেশ থেকে আসলেও যেমন সব ছাত্রের দক্ষতা, উদ্যোগ বা পরিশ্রম সমান হয়না আর সেই কারণে তাদের পরীক্ষার ফলও একরকম হয়না, বৃহত্তর অর্থনৈতিক জগতেও সেই কথাটা সত্যি। সমান সুযোগ পেয়েও সবাই তার সমান সদ্ব্যবহার করতে পারেনা, আর তাই সবার অর্থনৈতিক সাফল্য এক হবে, তা আশা করা যায়না।

প্রথম ক্ষেত্রে একজনের পরিবেশ তার সুযোগ পাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই একজনের যোগ্যতা বেশি হলেও, পরিবেশ বা সুযোগের অসাম্যের কারণে তারা পিছিয়ে থাকতে পারে। সুযোগ যদি সমভাবে বন্টিত না হয় তাহলে পুরুষানুক্রমিক বৈষম্য বজায় থাকে। এই সুযোগের অসাম্য সামাজিক ন্যায় বা অর্থনৈতিক দক্ষতা কোন দিক থেকেই কাম্য নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খানিক বৈষম্য অবধারিত এবং তা অবাঞ্ছনীয় নয়। আয়ের অসাম্য সব সময়েই আমাদের চোখে লাগে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতির অসাম্যও কি একই গোত্রের নয়? একজন বিখ্যাত লেখক বা চিত্রপরিচালক যে বাকিদের থেকে বেশি সম্মান বা খ্যাতি পান, তা কি অনর্জিত না অবাঞ্ছনীয়? তাই যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অধিকতর সুযোগ তৈরী হলেও তা বৈষম্যও ডেকে আনতে পারে।

বর্তমান কালে প্রগতিশীল নীতিসমূহের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত মানবসম্পদে বিনিয়োগের মাধ্যমে সুযোগ সৃষ্টির বৃহত্তর সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা এবং সুযোগ সৃষ্টিকে ব্যাহত না করা। এর থেকে ফলাফলের বৈষম্যও কমবে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, চরম দারিদ্র কমবে, যা আমাদের মত দেশে সবচেয়ে বড়ো অর্থনৈতিক সমস্যা । অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আর তার থেকে তৈরি হওয়া সুযোগের বিস্তার আমাদের শত্রু নয়। সমালোচনা হতেই পারে যে অর্থনৈতিক

সংস্কার বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে খোদ প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টের (২০০৯) তথ্য অনুযায়ী ৯০ এর দশকের প্রথম দিকে জনসংখ্যার ৪৫% দারিদ্রসীমার নীচে ছিল। এই শতকরা হিসাব বর্তমানে অর্ধেক হয়েছে, যার অর্থ হল ২০ কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার উপরে উঠে এসেছেন। সবাইকে চেপে রাখলে বৈষম্য হয়তো কমে কিন্তু তাতে দারিদ্রের সমস্যার সুরাহা হয়না। কিন্তু আত্মতুষ্ট হবার আগে এও ভেবে দেখা দরকার যে দারিদ্রসীমার হিসাবে যে আয়ের স্তরকে ধরে করা হয়েছে তার মানকে যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে তিন দশকের উচ্চহারে বৃদ্ধি স্বত্বেও জনগণের প্রায় ৮০% এই দারিদ্রসীমার চৌকাঠ পেরোতে পারেনি। এর থেকে বোঝা যায় দারিদ্রসীমার মান কতটা রক্ষণশীল ভাবে ধরা হয়।

অতএব হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির থেকে উঠে আসা উদ্বৃত্তের বন্টন নিয়ে ভারতবর্ষে বড় রকমের বৈষম্যের সমস্যা আছে। এই সমস্যা সমাধানে স্বাস্থ্য শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার এবং আরও বেশি পরিমাণে অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টিতে সচেতন প্রচেষ্টা চালানো দরকার যাতে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা উন্নয়নের সোপান বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসতে পারে। এছাড়াও প্রয়োজন ধনীদের করের আওতায় আনতে সচেতন প্রয়াস। বিশেষত, উত্তরাধিকার কর যা সুযোগের বৈষম্যের যেটি প্রধান উৎস সেই সম্পদের বৈষম্যকে বাড়তে দেয় না। উদ্যোগের বিস্তার বা অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সমস্যা নয়, তার সুযোগ নেবার ক্ষমতার বৈষম্য হল মূল সমস্যা। তাই ফলাফলের নয়, সুযোগের বৈষম্যের বিলোপ করা হওয়া উচিৎ প্রগতিশীল নীতির মূল ভিত্তি।

৩

তাহলে আমরা কোন দিকে দেব - বৃদ্ধি না অসাম্য? সেই আদ্যিকাল থেকে দেখছি, আমাদের দেশে আর্থিক নীতি-সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্কগুলো দুটো মূল বয়ানের যুগলবন্দিতেই ঘোরাফেরা করে। একদলের মন্ত্র বিকাশ, অন্যদলের দারিদ্র। এক দল যখনই দেখাতে যায় দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার কি চমৎকার বা চিনের সঙ্গে দৌড়ে আর কতটা এগোলাম আমরা অন্য দল অমনি হিসেব কষে দেখিয়ে দেয়, সামাজিক সূচকগুলোর দৌড়ে আফ্রিকার কোনও গরিব দেশ কিংবা ঘরের পাশেই তুলনায় গরিব পড়শি বাংলাদেশও এগিয়ে আমাদের থেকে। ভারতের ক্রমবর্ধমান আর্থিক প্রগতির বিজয়গাথার দৃপ্ত তালের ব্যান্ডপার্টির পাশেই নাছোড় সানাইয়ের মত বাজতে থাকে সামাজিক সূচকে ভয়াবহ দশার করুণ পাঁচালি। ধরুন আপনি একটা সফ্টওয়্যার তৈরি করলেন, উদ্দ্যেশ্য ভারতের অর্থনীতি নিয়ে লেখা কোনও নিবন্ধের ঝোঁক বোঝা। প্রথম শিবিরের

লেখা হলে ঘুরে ফিরে আসা শব্দ বা 'কি-ওয়ার্ড' হবে নিঃসন্দেহে 'বিকাশ' আর 'সংস্কার'। আর উল্টো শিবিরের জন্য? কেন, 'দারিদ্র' আর 'অসাম্য'!

আর্থিক বৃদ্ধি-কেন্দ্রিক বয়ানটির সমস্যা হল, দারিদ্র দূরীকরণ বা সামাজিক সূচকের মানোন্নয়নের জন্য আর্থিক বৃদ্ধি অপরিহার্য ঠিকই, কিন্তু শুধু সেটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের বহুকাঙ্খিত ১০ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধির হারের কথাই ধরা যাক। এই হারের চক্রবৃদ্ধিতে যদি বাড়ে, তাহলে আয় দ্বিগুণ হতে লাগবে সাত বছরের একটু বেশি । কিন্তু মুশকিল হলো, দারিদ্ররেখা এতটাই নীচে ধরা হয়, দ্বিগুণ হলেও মানুষ দরিদ্রই থেকে যায় । হিসেব কষলে দেখা যাবে, ঠিক দারিদ্রসীমায় বাস করেন যে মানুষটি, তাঁকে শুধুমাত্র এ দেশের বর্তমান মাথাপিছু গড় আয়ের (সারা বিশ্বের নিরিখে যেটা রীতিমত কম) সমস্তরে নিয়ে আসতেই টানা ২৬ বছর ধরে ১০ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে হবে; দুনিয়ার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনও দেশের টানা সিকি শতক ধরে দুই অংকের বৃদ্ধির হার (দশ শতাংশ বা তার বেশি) ধরে রাখার নিদর্শন নেই। এমন কি টানা সাত বছর এই হারে বৃদ্ধির (যাতে আয় দ্বিগুণ হবে) উদাহরণও বিরল । আর্থিক বৃদ্ধি আচ্ছে দিন আনতে পারে ঠিকই, তবে তার টিকির দেখা পেতেও অন্তত সেই সিকি শতক হা পিত্যেশ করে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দরিদ্র মানুষকে শুধু বৃদ্ধির ভরসায় রেখে দেওয়া বা বলা এখন কষ্ট করো, পরের জন্মে তোমার ভালো হবে, প্রায় একইরকম ।

পুনর্বণ্টন-কেন্দ্রিক বয়ানের সমস্যা, শুধুমাত্র পুনর্বণ্টনের উপরেই জোর দিলে গরিবদের পরিস্থিতিতে কোনও বাস্তব পরিবর্তন আসা অসম্ভব । বড়লোকদের ঘাড়ে করের বোঝা চাপিয়ে রাজকোষ ভরার ভাবনাটা সুখকর, সন্দেহ নেই। এবং তাতে নীতিগত কোন আপত্তি অন্তত আমার নেই । মুশকিল হলো, ভারতের যে ধনীরা এখন নিয়মিত বিশ্বের সবচেয়ে বিত্তবানদের তালিকা উজ্জ্বল করছেন, তাঁদের মিলিত সম্পদ জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশের বেশি নয় (নব্বইয়ের শতকে এটাই ছিল মাত্র ১ শতাংশ)। এ বার ধরা যাক এঁদের সবার সমস্ত টাকাকড়ি নিয়ে গরিবদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হল। গরিব বলতে এখানে দারিদ্রসীমায় বা তার নিচে বাস করা ৩৫ কোটি ভারতীয়ের কথাই ধরলাম। প্রত্যেকের ভাগে বর্তমান দারিদ্রসীমার নির্ধারণ মূল্যটুকুর থেকে খুব বেশি পড়বে না। আর তার চেয়েও বড় কথা, সেটা কিন্তু এককালীন আয়। একবার স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী হাঁসটিকে জবাই করলে, আর তাকে পাওয়া যাবেনা – সঞ্চিত ধন সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে বুঝলে হয় ধনসঞ্চয় বন্ধ হবে,

বা তা সরকারের নাগালের বাইরে কোথাও সরিয়ে নেওয়া হবে । তাই শুধু পুনর্বণ্টনের ওপর ভরসা করলে, দারিদ্রের সমবন্টন হবে, তাতে বড়লোকরা তো উচিত শিক্ষা পেল এই গোছের আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু গরিবের অবস্থার বিশেষ ফারাক হবে না । এর আরেকটা উদাহরণ আমরা আমাদের রাজ্যে দেখেছি ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে । ভূমিসংস্কার কাম্য ছিল, তার সুফলও পাওয়া গেছে । কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমান যা, তাতে আমূল পুনর্বণ্টন করেও দরিদ্র এবং ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার খুব উন্নতি হওয়া সম্ভব নয় ।

এর মানে একথা নয় যে বৃদ্ধি বা পুনর্বন্টন জরুরি নয় । দুটোই জরুরি, এবং পরস্পরের পরিপূরক, কিন্তু শুধু একটার ওপর ভরসা করলে বিপদ । বৃদ্ধি বা পুনর্বন্টনে মধ্যে শুধু একটিমাত্র পথের ওপর নির্ভর করলে কি হতে পারে সেটা বোঝাবার জন্যে দুটো চরম উদাহরণ পেশ করলাম মাত্র । দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র দূর করতে গেলে আর্থিক বৃদ্ধি সত্যিই জরুরি, এটুকু অন্তত স্যুটবুটওয়ালারা ভুল বলেন না । শেয়ার-বাজারের উল্লাসনৃত্যের জন্যে নয়, বা বিশ্বের সর্বাধিক ধনীর তালিকায় আবার কতজন ভারতীয় স্থান পেলেন বলে নয়, অর্থকরী কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর কারণেই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রয়োজন । কিন্তু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্যে গরিব মানুষদের মানবিক মূলধনের, অর্থাৎ, সোজা কথায় বলতে গেলে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত মৌলিক মানবসম্পদের প্রয়োজন । স্যুট-বুট ওয়ালারা ভুলে যান, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সুযোগ তৈরী করে এ যেমন সত্যি কথা, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার স্বচ্ছল ও দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষমতায় বড় ফারাক থাকলে, দারিদ্র কমবে অতি ধীরগতিতে আর অসাম্য বাড়বে ।

আসলে আমাদের উন্নয়নের যে সূচকগুলো, তার অনেগুলোই বড্ড স্থিতিশীল । কারোর বর্তমান আয় কত, শিক্ষার স্তর কি বা স্বাস্থ্যের মান কিরকম সেটা দিয়ে ভবিষ্যতে সে বা তার সন্তান-সন্ততি কেমন থাকবে, তা সব সময়ে ঠিকমত বলা যায়না । অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র যদি এক প্রজন্ম বা দুই প্রজন্মের বেশী স্থায়ী না হয়, তাহলে বলাই যায় বৃদ্ধি বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের জন্যে কাম্য । কিন্তু অর্থনীতির এক স্তরে তরতরিয়ে বৃদ্ধি হতে থাকছে, আর অন্য স্তর আটকে আছে দারিদ্রে এবং অশিক্ষায়, তাহলে তা বলা যাবেনা । তাই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার দীর্ঘমেয়াদী মানোন্নয়নই যদি উন্নয়নের লক্ষ্য হয় তাহলে প্রয়োজন এমন এক সূচকের যাতে আর্থিক সচলতা ধরা পড়ে । যেমন, দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষায় দুই প্রজন্মের মধ্যে অর্থনতিক অবস্থা, শিক্ষাগত মান এবং পেশাগত পরিবর্তনের তথ্য পাওয়া যায় তার

ভিত্তিতে এমন একটা সূচক তৈরী করা যায়, যাতে গড় আয় বা শিক্ষা কত বেড়েছে না দেখে উর্ধ্বমুখী সচলতা (upward mobility) ধরা পড়বে । এই সূচকের মধ্যে একটা বড় সময়ের পরিসরে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ধরা পড়বে । গবেষণার জগতে এইরকম সূচক অপরিচিত নয়, কিন্তু উন্নয়ন নিয়ে আমাদের দৈনন্দিন আলোচনায় সেগুলোর ব্যবহার এখনো খুবই সীমিত । বৃদ্ধি এবং দারিদ্র এমনকি অসাম্যের যে নানা সূচক আছে তাদের সবারই সীমাবদ্ধতা হল তাতে উন্নয়নের এককালীন স্থিরচিত্র ধরা পড়ে, কিন্তু আর্থিক সচলতার সূচকে উন্নয়নের চলমান এক চিত্র ফুটে ওঠে ।

আমাদের সমাজে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে অর্থনৈতিক গতিশীলতা কম। অর্থাৎ কিনা, বাবা-মায়ের প্রজন্ম থেকে সন্তানের প্রজন্মে আর্থিক অবস্থায় বদল কম, পেশা নির্বাচনেও তাই। গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা যদি আরও বেশি করে স্যুট-বুট পরা উচ্চ দক্ষতার কাজের দিকে যাওয়ার সুযোগ পেত, তাহলে এ স্লোগান আজ ধারে কাটত না । দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ শুধু নিজের খাওয়া-পরা নয়, সব মা-বাবার মত সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তিত । তাঁরা চান তাঁদের সন্ততি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে তাঁদের থেকে অনেক বেশি উন্নতি করুক । দরিদ্র শ্রমিক বা কৃষকের সন্তান শিক্ষার সোপান বেয়ে দক্ষ শ্রমিক বা পেশাদার বা ব্যবসায়ী হিসেবে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেনীতে উত্থান করবে, এই হলো অর্থনৈতিক সচলতার মূল কথা । আর তাই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের ছেলেমেয়েদেরও যদি স্বচ্ছলতর পেশায় ঢুকতে পারার সুযোগ থাকে, তাহলে কেনই বা তাঁরা ‘স্যুট বুট’-পরিহিত পেশাদার শ্রেণীর ওপর বিরাগ পোষণ করবেন?

কার্যত, কম-দক্ষতা থেকে মাঝারি দক্ষতার কাজে সরে এলে মজুরির হার বেড়ে যায় দ্বিগুণেরও বেশি। আবার মাঝারি দক্ষতার কাজ থেকে বেশি দক্ষতার কাজে গেলে একই ব্যাপার। একজন অদক্ষ শ্রমিকের সন্তান যদি উচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তাহলে এক প্রজন্মের মধ্যেই এক জনের ব্যক্তিগত আয় চার গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাজার তাদের জন্যই সুযোগ তৈরি করে যাদের এই মৌলিক পুঁজিটুকু রয়েছে । অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ফলে তৈরী হওয়া অর্থনৈতিক সুযোগ দরিদ্র শ্রেনীর শিশুদের আয়ত্বে আনতে গেলে, তাদের মানবসম্পদে বিনিয়োগ প্রয়োজন । কিন্তু বাজারের যুক্তি যেহেতু ফেলো কড়ি মাখো তেল, বাজারের হাতে ছেড়ে দিলে সামাজিক ভাবে লাভজনক হলেও, এই বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হবেনা । তাই, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রয়োজন I আর এই কারণেই শুধু বৃদ্ধি নয়, পুনর্বন্টনেরও

প্রয়োজন কারণ রাষ্ট্রের এই বিনিয়োগের জন্যে আর্থিক সঙ্গতি প্রয়োজন । মানবসম্পদে বিনিয়োগ প্রয়োজন, তা ছাড়া অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ধরে রাখা যাবেনা, আবার অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রয়োজন, কারণ করব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের আর্থিক সঙ্গতি না বাড়লে, মানবসম্পদে বিনিয়োগ হবেনা । অর্থাৎ, বৃদ্ধি এবং দারিদ্র দূরীকরণ পরস্পরের পরিপূরক, এবং এদের মধ্যে যোগসেতু হলো দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সচলতা বৃদ্ধির জন্যে মানবসম্পদে বিনিয়োগ । আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়ানো এবং দারিদ্র কমানোর লক্ষ্যের ভিতরে যে বিরোধ আছে বলে মনে হয় বৃদ্ধি বনাম পুনর্বণ্টন শিবিরের ঝগড়াঝাঁটিতে, সেটার সমাধান লুকিয়ে আছে এখানেই।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে আরো জানতে গেলে:

গ্রন্থ

১. *জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি*, অমর্ত্য সেন, আনন্দ অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০।

২. *ভারত - উন্নয়ন ও বঞ্চনা*, অমর্ত্য সেন, জঁ দ্রেজ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫।

৩. *অর্থনীতির যুক্তি তর্ক ও গল্প*, কৌশিক বসু, আনন্দ অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৮, আনন্দ পাবলিশার্স , প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪।

৪. *বিকল্প বিপ্লব - যেভাবে দারিদ্র কমানো সম্ভব* , স্বাতী ভট্টাচার্য , অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স,
প্রথম সংস্করণ, ২০১৭।

এই লেখকের লেখা অন্যান্য প্রবন্ধ

১. "অসম আরোহণ-অর্থনৈতিক চলমানতা ও সুযোগের রুদ্ধদ্বার", *আরেক রকম*, অষ্টম বর্ষ দশম সংখ্যা, ১-১৫ আগস্ট ২০২০, ১৬-৩১ শ্রাবণ ১৪২৭।

https://personal.lse.ac.uk/ghatak/arekrakam1.pdf

২. "র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল - তথ্যভিত্তিক গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান", *মনোরমা ইয়ারবুক*, ২০২০।
https://personal.lse.ac.uk/ghatak/RCT.pdf

৩. "সব অসাম্য নয় সমান", *অনুষ্টুপ*, শারদীয় সংখ্যা, ২০১৪ |

http://econ.lse.ac.uk/staff/mghatak/anushtup2014.pdf